#আমি পদ্মজা পর্ব ৩

‘আপা,স্কুলে যাবা না?’ পূর্ণা পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করল।
‘যাব।’
‘তাড়াতাড়ি করো।’
তাড়া দিয়ে পূর্ণা বাড়িতে ঢুকল। পদ্মজা বাড়ির পিছনের নদীর ঘাটে উদাসীন হয়ে বসে আছে। এ নদীর নাম মাদিনী (ছদ্মনাম)। গ্রীষ্মকাল বিদায়ের তিন সপ্তাহ চলছে। এখন বর্ষাকাল। মাদিনী জলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে যেন স্রোতস্বিনী। ঘোলা জলের একটানা স্রোত বয়ে যায় সাগরের

দিকে। উজান থেকে ভেসে আসছে ঘন সবুজ কচুরিপানা। পদ্মজার এই দৃশ্য দেখতে বেশ লাগে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে মাদিনীর স্বচ্ছ জলের দিকে। মাদিনীর বুকের উপর দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। লঞ্চ দেখে এক মাস আগের ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। সেদিন রাতে হেমলতা ছুরি ধার দিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন। পদ্মজা কাঁপা পায়ে রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নামায পড়ে খেতে বসল। তখন হিমেল হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে। হিমেল হচ্ছে হেমলতার ছোট ভাই।

‘ আপা? এই পদ্ম, আপা কই? ‘
হিমেলের কণ্ঠ।
‘ কি হইছে মামা?’ জবাব দিল পদ্মজা।
পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে
হেমলতাকে হিমেল ডাকল,’ আপা,এই
আপা।’
হেমলতা বাড়ির পিছন থেকে ব্যস্ত
পায়ে হেঁটে আসেন।
‘ কি হয়েছে?’
হিমেল হেমলতাকে দেখে হাউমাউ
করে কেঁদে উঠল।
‘ আপা, ভাইজান খুন হইছে। রাইতে
কে জানি মাইরা ফেলছেরে আপা...”

হিমেল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। পদ্মজা তাৎক্ষণিক সন্দিহান চোখে মায়ের দিকে তাকাল। হেমলতাকে দেখে মনে হলো, তিনি চমকেছেন। অথচ, তার চমকানোর কথা ছিল না। নাকি হিমেলের সামনে অভিনয় করলেন?

‘ পূর্ণা,প্রেমাকে ওদিক আসতে দিস না পদ্ম। আমি আসছি।’

হেমলতা বাড়ির বাইরে মিলিয়ে যান। হিমেল পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেলেটা বোকাসোকা, জন্মগত প্রতিবন্ধী। বাইশ বছরের হিমেল এখনো শিশুদের মতো আচরণ করে। কথায়

কথায় খুব কাঁদে। সেখানে তার ভাই খুন হয়েছে। এক মাস তো প্রতিদিন নিয়ম করে কাঁদবে।

পদ্মজা রাতেই ভেবেছিল এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও এখন ভয় পাচ্ছে খুব। পুলিশ কী এসেছে? মাকে কী ধরে নিয়ে যাবে? ভাবতে গিয়ে, পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। গ্রামের কাছেই শহর, থানা। পুলিশ নিশ্চয় চলে এসেছে। পদ্ম ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। সে ঘামছে খুব। নাক,মুখ,গলা ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা খুনের কথা শুনেই খুব ভয় পেয়েছে। তার মনে হচ্ছে সেও খুন হবে। খুব বেশি ভীতু

পূর্ণা। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। চোখে ভাসছে, হেমলতাকে পুলিশ শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার খুব কান্না পাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল পদ্মজা। মাথায় ওড়নার আঁচল টেনে নিয়ে পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,
‘ প্রেমারে দেখে রাখিস বোন। ‘

বাড়ি ভর্তি মানুষ। আরো মানুষ আসছে। হেমলতা মানুষজনকে ঠেলে হানিফের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ফর্সা রঙের দুই জন মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। আকস্মিক আক্রমণে হেমলতা

অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। খেয়াল করে দেখেন, দুজন মহিলা তাঁর মা আর বোন। তারা হাউমাউ করে কাঁদছে। কিন্তু হেমলতার তো কান্না পাচ্ছে না। ব্যাপারটা লোকচক্ষু ঠেকছে না? একটু কী কান্নার অভিনয় করা উচিৎ?
হানিফের মৃত দেহ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছেমতো কুপিয়েছে।
হেমলতার তা দেখে শান্তি লাগছে! এমন শান্তি অনেকদিন পাওয়া হয়নি।
পদ্মজা সেখানে উপস্থিত হয়। হেমলতার নজরে পড়ে। ভীতু চোখে মায়ের চোখের দিকে তাকাল পদ্মজা। হেমলতা ভ্রু কুঞ্চিত করে আবার স্বাভাবিক করে নেন। পদ্মজা চোখ

ঘুরিয়ে দেখছে পুলিশ এসেছে নাকি। চারিদিকে এতো মানুষ। পদ্মজাকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে দেখে হেমলতা এগিয়ে আসেন। চোখমুখ শক্ত করে পদ্মজার মুখ ঘুরে দেন। পদ্মজা দ্রুত ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল। তার মা চায় না সে কখনো এতো মানুষের সামনে থাকুক।
হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, পদ্মজা গোয়ালঘর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আসল। জিজ্ঞাসাবাদ করে হানিফের লাশ নিয়ে

গেল। লোকমুখে শোনা যায়, হানিফ খুন হয়েছে শেষ রাতে। এরপর নদীতে ফেলা দেওয়া হয়। লঞ্চ ঘাটে লাশ ভাসে।
হেমলতাকে পুলিশ নিয়ে যায়নি বলে পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। মানুষের ভীরও কমে গেছে। হেমলতার মা কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে উঠোনের এক কোণে বসে আছেন। পদ্মজা গুটি পায়ে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। সেই হাসি দেখলেন হেমলতার মা মনজুরা। তিনি কিছু একটা ভেবে নেন। হেমলতার

কাছে এসে কিড়মিড় করে বলেন, ‘তুই খুন করছস?’

‘ তোমার কেন মনে হচ্ছে এমন?’

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। অথচ, পদ্মজা এই প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়েছে খুব। যদি নানু পুলিশকে বলে দেয়? পুলিশ তো তার মাকে নিয়ে যাবে!

‘ কাইল রাইতে তুই আইছিলি হানিফের ঘরে। আমি দেহি নাই?’ রাগে কাঁপছেন মনজুরা।

‘ হুম আসছি।’ হেমলতার নির্বিকার স্বীকারোক্তি।

‘কেন মারলি আমার ছেড়ারে? তোর কি ক্ষতি করছে? ‘

‘ আসছি বলেই আমি খুন করেছি?’
‘ এতো রাইতে তুই তার কাছে আর কী দরকারে আইবি?’
‘আমি তাকে মারতেই যাব কেন?’

মনজুরা আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হেমলতার দিকে। হেমলতার চোখ মুখ শক্ত। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মনজুরা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ পুলিশের কাছে যামু আমি।’

পদ্মজা কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, ‘নানু এমন করো না।’

হেমলতা নীচু স্বরে কঠিন করে বললেন, ‘ আমার মেয়েদের থেকে

আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করো না আম্মা। ফল খুব খারাপ হবে।’

পদ্মজার মনে হলো মনজুরা ভয় পেয়েছেন। মনজুরা সবসময়ই হেমলতাকে ভয় পান। তিনি চুপসে যান। শুধু ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পদ্মজা বুঝে উঠতে পারে না, তার নানু কেন ভয় পায় মাকে? মায়ের অতীতে কী ঘটেছে? কেন তিনি এমন কাঠখোট্টা? ছেলের খুনীকে কোনো মা ছেড়ে দেয়? নানু কেন ছাড়লেন? মেয়ে বলে? নাকি অন্য কারণ? কোনো উত্তর নেই। এসব ভাবলে উল্টো মাথা ব্যাথা

ধরে। অন্য আট-দশটা পরিবারের মতো কেনো না তারা? নাকি গোপনে সব পরিবারেই এমন জটিলতা আছে? প্রশ্ন হাজারটা! উত্তর কোথায়?

সেদিন রাতে খাওয়ার সময় হেমলতা নিম্নস্বরে পদ্মজাকে বললেন, ‘পদ্ম?’
‘জ্বি,আম্মা।’
‘আমি হানিফকে খুন করিনি। কারা করেছে তাও জানিনা।’

কথাটি শুনে পদ্মজা খুব চমকায়। তার মা মিথ্যে বলে না। তাহলে কারা খুন করল? পদ্মজা প্রশ্ন করল, ‘তাহলে শেষ রাতে মামার কাছে কেন গিয়েছিলে আম্মা?’

হেমলতা জবাব দেননি। খাওয়া ছেড়ে উঠে যান।

পদ্মজার ভাবনার সুতো কাটল কারো পায়ের আওয়াজ শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে মোর্শেদকে দেখতে পেল। মোর্শেদ পদ্মজাকে ঘাটে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকান।

‘ এই ছেড়ি যা এন থাইকা। ‘

পদ্মজার কান্না পায়। খুব খারাপ লাগে। নিঃশব্দে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তা আড়াল করে ব্যস্ত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

———————

কয়েক মাস পর পদ্মজার মেট্রিক পরীক্ষা। তিন বোন বই নিয়ে সড়কে উঠল। পদ্মজার কোমর অবধি ওড়না দিয়ে ঢাকা। পূর্ণা একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়া অবধি কথা বন্ধ হবে না। মাঝে মাঝে জোরে জোরে হাসছে। মেয়েটার হাসির রোগ আছে বোধহয়। একবার হাসি শুরু করলে আর থামে না। পদ্মজা বার বার বলছে, 'আম্মা রাস্তায় কথা বলতে আর হাসতে মানা করছে। চুপ কর না।'

তবুও পূর্ণা হাসছে। বাড়ির বাইরে এসে সে মুক্ত পাখির মতো আচরণ করে।

তাকে দেখে মনে হয়, খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছে।

‘ পদ্ম... ওই পদ্ম। খাড়া।’

পদ্মজা ক্ষেতের দিকে তাকাল। লাবণ্য ক্ষেতের আইল ভেঙে দৌড়ে আসছে। লাবণ্য আর পদ্মজা এক শ্রেণীতে পড়ে। লাবণ্য কাছে এসে হাঁপাতে থাকল। শান্ত হওয়ার পর চারজন মিলে স্কুলের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

‘ বাংলা পড়া শিখে এসেছি আজ?’

পদ্মর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে লাবণ্য বলল, ‘আরে ছেড়ি বাড়িত শুদ্ধ ভাষায় কথা কইলে বাইরেও কইতে হইব নাকি?’

‘আমি আঞ্চলিক ভাষা পারি না।’

লাবণ্য অসন্তোষ প্রকাশ করল। সে অলন্দপুরের মাতব্বর বাড়ির মেয়ে। তাদের বাড়ির সবাই শিক্ষিত। তবুও তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। পরিবারের দুই-তিন জন সদস্য ছাড়া। আর পদ্মজার চৌদ্দ গুষ্ঠি মূর্খ,দুই-তিন জন ছাড়া। তবুও এমন ভাব করে! আঞ্চলিক ভাষা নাকি পারে না!

‘সত্যি আমি পারি না। ছোট থেকে আম্মা শুদ্ধ ভাষা শিখিয়েছেন। উনিও বলেন। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেই আরাম পাই।’

‘ পূর্ণা তো পারে। ‘

‘আমার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয় না।’

‘ আইচ্ছা বাদ দে। শুন, কাইল আমরার বাড়িত নায়ক-নায়িকারা আইব।’

পূর্ণা বিগলিত হয়ে প্রশ্ন করল, ‘কেন আসব? কোন নায়ক?’

‘ শুটিং করতে। ছবির শুটিং।’

পদ্মজা এসবে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না। পূর্ণা খুব আগ্রহবোধ করছে। সপ্তাহে একদিন সুমিদের বাড়িতে সাদাকালো টিভিতে সে ছায়াছবি দেখতে যায়। তাই অভিনয় শিল্পীদের প্রতি তার আগ্রহ আকাশছোঁয়া। পূর্ণা গদগদ হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, ‘কোন নায়ক নায়িকা? বল না লাবণ্য আপা!’

‘ দাঁড়া! মনে করি। ‘

পূর্ণা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। এরপর মনে হতেই বলল,
‘লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী।’
‘তুমি আমার ছবির নায়ক-নায়িকা?’
‘হ।’

স্কুলের যাওয়ার পুরোটা পথ লাবণ্য আর পূর্ণা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা করল। মূল বক্তব্যে ছিল লিখন শাহ।

চলবে...